ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা ?

জয় গোস্বামী

স্নান

সংকোচ জানাই আজ ; একবার মুগ্ধ হতে চাই।
তাকিয়েছি দূর থেকে। এতদিন প্রকাশ্যে বলিনি।
এতদিন সাহস ছিল না কোনো ঝর্নাজলে লুণ্ঠিত হবার–
আজ দেখি, অবগাহনের কাল পেরিয়ে চলেছি দিনে দিনে ...

জানি, পুরুষের কাছে দস্যুতাই প্রত্যাশা করেছ।
তোমাকে ফুলের দেশে নিয়ে যাবে বলে যে-প্রেমিক
ফেলে রেখে গেছে পথে, জানি, তার মিথ্যা বাগ্‌দান
হাড়ের মালার মতো এখনো জড়িয়ে রাখো চুলে।

আজ যদি বলি, সেই মালার কঙ্কালগ্রন্থি আমি
ছিন্ন করবার জন্য অধিকার চাইতে এসেছি ? যদি বলি
আমি সে-পুরুষ, দ্যাখো, যার জন্য তুমি এতকাল
অক্ষত রেখেছ ওই রোমাঞ্চিত যমুনা তোমার ?

শোনো, আমি রাত্রিচর। আমি এই সভ্যতার কাছে
এখনো গোপন করে রেখেছি আমার দগ্ধ ডানা ;
সমস্ত যৌবন ধরে ব্যাধিঘোর কাটেনি আমার। আমি একা
দেখেছি ফুলের জন্ম মৃতের শয্যার পাশে বসে,
জন্মান্ধ মেয়েকে আমি জ্যোৎস্নার ধারণা দেব বলে
এখনো রাত্রির এই মরুভূমি জাগিয়ে রেখেছি।

দ্যাখো, সেই মরুরাত্রি চোখ থেকে চোখে আজ পাঠাল সংকেত –
যদি বুঝে থাকো তবে একবার মুগ্ধ করো বধির কবিকে ;
সে যদি সংকোচ করে, তবে লোকসমক্ষে দাঁড়িয়ে
তাকে অন্ধ করো, তার দগ্ধ চোখে ঢেলে যাও অসমাপ্ত চুম্বন তোমার ...
পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি
উন্মাদ কবির সঙ্গে স্নান করছ প্রকাশ্য ঝর্নায় !

‘আমরা মৃত্যুর আগে–’

মধুর ও মধুর, তুমি নমস্য বলে
কোনো ভক্ত কি পাগল বা কোনো উন্মাদ মধুসেবী
পায়ে মুখ রেখে যদি প্রণিপাত করে
তুমি নমস্য জেনে স্বেচ্ছায় ‘নমি’ বলে ডাকে যদি
তুমি অপরাধ নিয়ো না, এমন জ্বলমান ঔষধি
ওরা যে কখনো পায়নি ওদের পরিজন নেই ঘরে
কে ওরা মাতাল কে ওরা পাগল কে ঘাতক মধুসেবী
যায় ডুবে যায় কালো মূর্ছায় তুমি সে-মূর্ছাজলে
দাও দাও আরো ঘন মাধুর্য – ‘মাধু’ বলে ডাকে যদি
কোনো আপত্তি কোরো না গভীর, মূর্ছার পথ ধরে
আজকে রাত্রে বুকে উঠে এসো দেবী !

কোজাগর

ঘুমন্ত খড়ের দিকে মাটি ঘেঁষে চলেছে আগুন
দণ্ডিত অশ্বেরা সব আস্তাবলে ঘুমে কি বিভোর ?

পথ যেন অচেতন : ঘুমে হেঁটে শিখরে পৌঁছয়
তলায় অপেক্ষারত খাদ তার বক্ষ খুলে ধরে

তবে আজ খোলো ঘুম খোলো ঘুম, এই চিরঞ্জীব
সরোবর খুলে দাও ফুলের আরম্ভে কোজাগর

পথ শুধু অচেতন-ঢেউ তুলে তলহীনতায়
তার পরলোকগত শেষ পুষ্প সন্ধানে চলেছে

চলেছে আগুন সব কুমারীর প্রতি, চুপিসাড়ে –তবে
ওরাও কি ঘুমজলে ভোর ?

খোলো ঘুম খোলো ঘুম খোলো ঘুম খোলো পৃথিবীর
সব পুষ্প খুলে দাও জয়ের আনন্দে কোজাগর

এ-রাত্রে প্রথমতম চন্দ্রমা নিজের
পূর্ণরাগ উন্মোচন করো নীল মুমূর্ষুর মুখে

বলো সুর, জীবিতের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি, বলো আজ
দিকে দিকে অশ্বেরা স্বাধীন ....

ভোর, ১০ই জানুয়ারি

পাখিরা বসেছে। সাদা আলো আসে পাতার ওপরে।
কে যেন শীতের মেয়ে পিঠে করে কুয়াশার ঝুড়ি নিয়ে তার
ফিরে গেল চা-বাগানে। আর কেউ তাকে এই ভোরে
চলে যেতে দেখেছে কি ? না দেখেনি। এই দৃশ্য শুধু বিধাতার।

না হলে কে পাখিদের এত ভোরে পাঠিয়েছে বাগানের কাজে ?
ঝারি দিয়ে ভিজিয়েছে কে-ই বা গাছের পাতা, ঘাস ?
শীতের মেয়েকে একা ঝাপসা ওই পাহাড়ের কাছে
নেমে যেতে তুমিও কি দেখলে না ? আমাকে জানাও, সুবাতাস !

দূর চা-বাগান থেকে আজ তবে সত্যিই কি কুয়াশা সাঁতার
দিয়ে চলে এল হাওয়া ? রোদ এসে পড়ল কি পাতার ওপরে ?
দূরে দূরে জাগে টিলা। এ-দৃশ্য যে শুধু বিধাতার
সে-ই শুধু মেনে নেয় যে উঠে পড়েছে এত ভোরে !

গুটিপোকা

পাথরের মধ্যে আলো
পাথর পেরিয়ে
চাপা দাগ

ঘাসে ঘাসে চলে গেছে
থ্যাঁতলানো ঘাসের
রেখাগুলি

উঁচু শিলাস্তর কেটে
দুলতে দুলতে
নেমে এল

দোলক, বলের মতো –
এতদিন চোখে
যা ছিল না

চারিদিকে লাল আভা
গাছে গাছে গান
আর ডানা

শুধু, হাওয়া কেটে কেটে
বেরিয়ে এলাম
গুটিপোকা

এত আলো কেটে কেটে
বেরিয়ে এলাম
গুটিপোকা

পড়ে রইল লাল আভা
গাছে গাছে গান
আর ডানা

হোটেলের ঘরে একজন

তোরা সব উঠে গেলি পাহাড়ে ঝোলানো সরু ব্রীজে –
তোদের ধূসর জামা, ছেঁড়া-ছেঁড়া নীল-সাদা টুপি
ভেসে ভেসে এল তার হোটেলের সারাঘর ভিজে –
প্যাগোডার মতো ছাদ –তার পাশ দিয়ে চুপি চুপি

এমন বিব্রত, সিক্ত ঘরখানি লক্ষ করে তিনজন ঝাউ
সার বেঁধে উঠে যাওয়া পাইনের সবুজ রিবনে
যে-কটি জলের কণা ছিল, তারা হাওয়া লেগে বাতাসে উধাও ....
এমন বাতাস যার কোনোদিন ওঠেনি জীবনে

সে দ্যাখো : আকাশ থেকে নেমে এসে একজন লামা
মুণ্ডিত মাথায় একা বসেছেন তাঁর শুভ্র মঠের শিখরে
রুপোলী ঝলকে জ্বলছে দূরের ঝুলন্ত ব্রীজ, ভাসমান নীল-সাদা জামা
একজন মুগ্ধ শুধু বসে আছে হোটেলের ঘরে।

মহৎ

ও মহৎ, পরিচর্যা করো মনখানি। এই আজ
দিলাম তোমার হাতে সোনারঙ রেকাবি কাঁসার
জগতে দুর্লভ এই বস্তু যেন ভুলেও কখনো
যেয়ো না মার্জনা করতে, নিয়ো না অপর কারো হাতে

একে তো পাগল, তাকে বলো কিনা নৌকো না দোলাতে ?
প্রাণ, কী প্রকারে আমি প্রাণ খুলে দেখাই বলো তো ? ও মহৎ,
তুমি বই কে বা আর নাওয়া খাওয়া করাত ছেলেকে ? কে বা ওর
দিত হাতে খড়ি ? প্রাণ, আমা হেন শিশু যে দুর্লভ !

তোমাকে নিশ্চয় আমি পুত্ররূপে চাইতাম ঠাকুর, কিন্তু তুমি
এই জন্মে কোথাকার কোন্ এক মেয়ে হয়ে এসে
যেভাবে আমার মন কেড়েছ তুলনা হয় না তার।
আজ পুনঃপুন মরি ওই হাতে, পরিচর্যা করো মৃত্যুখানি ...

সখা

রসোধারা শেখার আগেই
রূপ
ধরেছ শাল্মলী
তরু
আমি সখার বাহনে

চলেছি
উড্ডীন-প্রায়
ও আমাকে ধরে, আমি ওকে
৩১ তারিখ, রাত্রে।
বাড়ি আসি।
ঘুমিয়ে পড়লাম।
ঘুম।
১২টা ৪০শে উঠে জল
খেলাম, শাল্মলীতরু
সখার বাহুতে রেখে
মন
বাইরে এসে
দেখি এই পরিপূর্ণ ফাল্গুনসময়ে,
বন্ধু
ছাদেই মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে
ছাদ
হারিয়ে চলেছে ওই হারিয়ে চলল তার দেহতল থেকে

একটি প্রেমের দৃশ্য

যতদূর মনে পড়ে একটি অশ্ব
তার মাটিতে ঠেকে যাওয়া পাকস্থলী
তার নাসার বিস্ফরিত ছিদ্র
তার আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ঘাড়
যতদূর মনে পড়ে তার বাদুড় শরীর
তার ধারালো সুন্দর ঠোঁট
ও, অবশেষে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসা
মাঝখান দিয়ে কাটা জিভ
যতদূর মনে পড়ে একটি কচ্ছপ
আর, বিরাট বর্তুল
পিঠ
যার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে অশ্বটিকে আঁকড়ে ধরেছে
তীব্র আঙুলে সেই বাঙালী মেয়েটি...

বাৎসরিক

নাম লিখেছি একটি তৃণে
আমার মায়ের মৃত্যুদিনে

তিল

তণ্ডুলের পাশ থেকে উঠে
একটি তিল হাওয়ায় হাওয়ায়
সারাদিন ধরে মাথা কুটে
শেষে একটি মুখ খুঁজে পায়
চিবুকের ঠিক পাশে ওর
প্রিয় স্থানটিতে বসে, আর
কবি দ্যাখে : ওই বালিকার
তিলফুলে মরেছে ভ্রমর

ব্যোমভোলা

হিংসা হয় আমার, এখন যার দিকে সে দেখুক, ওই মুখ দু-হাতে ধরেও
আমার
হিংসা হয়
আর কয়েকঘণ্টা পরে, আমার মৃত্যুই হয় যদি, আমি মৃত্যুকে শেখাব
মৃত্যুভয়

কেমন একটা করে, কিছু বুঝতেও পারিনা, শরীর আগুন হয়ে উঠল,
আগুন
প্রদীপ চায়
প্রদীপ কোথায় প্রদীপ, দোলে সমুদ্রে কী তুফান, যাও নৌকো ধরে বাঁচো,
নৌকো
উলটে যায়

তলায় তলায় তলায়, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ, আমার হাত ধরে কে
বাঁচায় ? তার
চুল খোলা
চুল জড়িয়েমড়িয়ে মাথায় এ তো খুলতে পারছি না আমি পাগলছাগল
হয়ে এখন
ব্যোমভোলা !

২০শে নভেম্বর, সকাল

এতদিন জলে আছি। আজ দিন আগুনে কাটুক।

পাললে পালক লাগে। সে আমার লালন পালন।
একবিন্দু জল আমি তাকে বিনা স্পর্শ করব না –

মাথা যেই আসে কোলে, এক বজ্রস্পর্শে নভোমুখ
ফেটে সর্বস্বান্ত হই হাড়পাঁজরা-সর্বস্ব উজবুক !

২০শে নভেম্বর, সন্ধ্যা

তোমার সঙ্গে ঘুমোবো আজ
মাটিতে হোক, আগুনে হোক, জলে
যেখানে বলো ঘুমোবো আজ
যেখানে পারি জায়গা করে নেবো
এখন আমার হুঁশ নেই আর
কোন্ কালীর দিব্যি
ভালো মন্দ চুলোয় যাক গে
মোদ্দা কথা শোনো–
তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না

১৭ই অক্টোবর

মুকুল, এই হাত আমি কেটেই ফেলতাম যদি তুমি এসে
না ধরে রাখতে। এ-হাত তো মাটির হাত, এই আঙুল, এও তো
মাটির আঙুল, জল লাগালে গলে যেত কাদায় কাদায়, পাঁক হয়ে যেত,
তুমি

প্রাণ দিলে তাই আমি প্রাণী নামে পরিচিত আজ, তুমি চক্ষু দিলে
তাই, তাই ঘুমোতে পারলাম। তবে, ঝরো মুকুল, ঝরো
আমি জাতিস্মর বন্ধু নিয়ে পথে পথে কুড়োই তোমাকে ...

৭ই ডিসেম্বর

যদি-না মৃত্যু বলি—মিথ্যে বলব।

এরকম আচমকা শ্বাস বন্ধ হলে
ফেটে যায় একমুহূর্তে—সিন্ধুগর্ভ :

শিশুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে –

শিশু নয়, ছদ্মবেশে বাচ্চা পরী
আমি তার আঙুল ধরে বেরিয়ে পড়ি

বেরিয়ে, একমুহূর্তে মৃত্যু হলে –
নিজেকে বুঝতে পারি পুরুষ বলে

নইলে সমস্তটাই মিথ্যে হতো
কেননা, আমি যে তার ছেলের মতো !

আলোহাওয়া

ধুলোরও সম্মতি আছে।
পথেরও আপত্তি কিছু নেই। গাছ ?
জানি, সেও রাজি হয়ে যাবে

যদি আমি ঘরের অভাবে
একবার সাহস করে ওই,
ওই একজনকে নিয়ে গাছের, ধুলোর পথে
সারাদিন লুকিয়ে ঘুমোই !

আলোহাওয়া : ২

আলো হাওয়া আলো হাওয়া আলো হাওয়া যা বুঝেছ বলো ভাই
হাওয়া আলো হাওয়া জ্বালো হাওয়া ঢালো হাওয়া যা ঢেলেছ বলো তাই
চোখ কী দেখেছে চোখ প্রথমে বোঝেনি কেন বোঝেনি ও চোখ খোলো
পাতা
পাতা যদি খুলি তবে জলে ভেসে যায় দেশ জল থেকে সিঁড়ি ধাপে ধাপে
কে আসে কে আসে হংসমানবী ডানায় বুক সাবধানে আড়াল করে শুধু
তোমাকে দেখতে দেবে বলে আলো হাওয়া আলো জল কেউ ওদিকে
দেখো না...।

ঘুম

কানে কে মন্ত্র পড়িস্ ? –(কর্ণপিশাচ, কর্ণপিশাচ !)

দুটো সাপ, –শঙ্খ লাগা–সন্ধেবেলায় মাঠের ওপর
আছড়ায়, দাঁড়িয়ে ওঠে –অন্ধকারে–কোমরে ভর

মাঠে সব পাহারাদার : এই দুটো গাছ, ওই দুটো গাছ
ওপাশে আবার দুটো –
(এটা ভারি অদ্ভুত তো !
বারবার দুটোই কেন ? এর মানে কী ? কী চলতে চাস ?)

জানি না, দেখতে পাইনি –সারা মাঠ ধুলোয় আঁধার...
দুটো সাপ, ওই দুটো সাপ, ওরা না –কী বলবো আর –

ধুলোতেই ঘুমিয়ে কাদা !

দেবী

অন্ধকারে আমি সেই দেবীকে বিশ্বাস করলাম
কী মধুর আক্রমণ, কত ভাগ্যে হত এই প্রাণ

শয়ন করেছে আজ বাতাসের পারে সন্ধ্যামুখে
সন্ধ্যার শিয়রে মাথা, পা গিয়েছে ভোররাত ছাড়িয়ে

পায়ে যদি পড়ে ঊষা জলে তবে উঠেছে আঙুল
অস্তে যদি নামো তবে চুলে মাখা বালুরাশি লাল

উড়ন্ত, আকাশ প্রায় কেশর –বৃষ্টির শেষ দেখে
বিশ্বাস করলাম আমি মরব ওর কোলে মাথা রেখে

প্রীতিভোজ

হেসো না দোয়েল, আমি বরাবর বাগানের লোক, আমি
নানারকমের কাজ জানি। যেমন এই, ঘাস তোলা বীজ রাখা
হাতে হাতে ফুলগাছ লাগানো, তুমি হেসো না দোয়েল আমি প্রথমদিনেই
তোমাকে চিনেছি গাছে বসবার সময় –কারণ আমি চিরকাল
গাছেদের লোক। এসবের মধ্যে আমি যাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি
প্রথমদিনেই বললে, 'আমাকে পছন্দ, মালী ?' পছন্দ, পছন্দ। আর
কতবার করে বলতে হবে আজ খুদকুঁড়ো যা পেয়েছি কুড়িয়ে বাড়িয়ে
যোগাড় করেছি তুমি চালেডালে যা হোক একটা কিছু শিগগির চাপিয়ে
দাও
আমি গিয়ে বন্ধুদের খেতে বলে আসি ...

ফল

আছো এ দিবসপার্শ্বে মুখ 'পরে চিরলতাদোল
লতা না কিরণ এরা, পড়োনি তো এমন মায়ায়
কভু বৃষ্টি এল এরা, কভু মুখে জলজ্যোৎস্না ফেলে
তোমার ঘুমন্ত মুখ জীবিত না মরা দেখল চাঁদ
তোমার সর্বস্বনাশ করে চন্দ্রনাশন লতারা
মুখ 'পরে দোল দেয় দোল এক কিনারে দিবস
টক্‌টক্ টক্‌টক্ নিজধ্বনি নেই তো তক্ষক
তাই ফলে ঢুকে আছো। মুখটুকু জাগা মুখ 'পরে
চিরলতা দোল দোল কভু করল মেঘ কভু এরা
মেঘে দ্যাখা দিল চাঁদ একটি ফলের মতো ফল
তুমি মধ্যে আছ তবু দোলে এক দিবস কিনারে
আর প্রান্তে যামিনী হে জাগাও লো তারা কিরণময়
নিশিপ্রান্তে বসে দেখি চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবী উদয়

জড় [শংকরাচার্যের প্রতি]

কী পারে জড়ের মাংস ? হাওয়া এসে ওড়ায় তাঁবুকে ...
শরীর গুহায় রেখে চলে গেলে –চিতায় নৃপতি
উঠে বসলেন, আর রাত্রিবেলা তাঁর যত সতী
তোমার ঘোড়ার মুখে অবিশ্রাম চাবুকে চাবুকে
ফেনা তুলে দিতে লাগলো, তখনো কি আঁধার গুহাতে
যে-অঙ্গ নেভানো, তার জড়মাংসে গরম লাগেনি ?
চায়নি কি নখক্ষত ? চায়নি সিঁদুরমাখা বেণী
আছড়ে পড়ুক মুখে ? কাদারক্ত লেগে যাক হাতে ?

শিষ্যরা বলবে না কিছু, গুরুকাঠ আগলে আছে তারা।
তুমিও উপোসী বলে বোঝ –কুমারীরা ঘরে ঘরে
যার পাথরের অঙ্গে পূজা দেয় –সে অন্য শঙ্কর।
তুমি কি ভিক্ষুক দেহে ফিরে এসে এক বছর পরে
ভাবোনি, সেদিন রাত্রে চাবুকে উড়িয়ে নিল যারা
আজ এই জড়ের মাংসে তারা ফের ঝলসে দিক জ্বর ?

তোমার মৃত্যুর মুখ

তোমার মৃত্যুর মুখ একবার তুলে ধরেছিলে
গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে আমার
কয়েক মুহূর্ত পরে কিছু নেই, শুধু নীল প্রান্তরে কুয়াশা ...
আমি কাকে ডাকি আজ ? কাকে বলি একদিন যত আচ্ছন্নতা
রচনা করেছ তুমি আজ এসে সেইসব কুহেলী সম্পূর্ণ করে যাও
কোথাও বাঁশরী বাজে, তবু তুমি কুঞ্জবনে ছেড়ে গিয়েছিলে
কে আর খেলবে হোলি ? কে আর ছড়াবে ফাগ, যমুনার ধারে !
পায়ের নূপুর খুলে রেখে দেয় সমস্ত গোপিনী
যদি কোনো শব্দ ওঠে, যদি শুনতে পায় ননদিনী !
শয্যায় পেয়েছো তাকে একরাত্রে। তার ওষ্ঠচুম্বনের কালে
দেখেছো সে পতি নয় মাতা নয় কন্যা নয় পিতা নয় কারো
বিশাল বাষ্পের মতো সে একাকী উঠে যায় শূন্যের চূড়ায়
মুখের গহ্বর থেকে প্রতি পলে ঝলকে ঝলকে
উদগীরণ করে আলো, অতিকায় গ্যাসপিণ্ডময় নীহারিকা
তোমার জরায়ু ছেঁড়া ওই শিশু তোমার শিশুর পিতা ও-ই
তুমি যেন স্বপ্নে দ্যাখো জল ভেদ করে ওঠে কালীয়নাগের দীর্ঘ ফণা
তার উপর বংশীধারী নৃত্যরত রয়েছেন –কবে যেন এই নিধুবন
ত্যাগ করে গিয়েছেন গুণধাম, তবু আজো তাঁর
অলক্ষ্য বাঁশির ধ্বনি জেগে ওঠে কোথায় শূন্যের অন্তরালে
যেখানে পৌঁছয় না শব্দ, যেখানে পৌঁছয় না আলো, যেখানে বেতার
তরঙ্গ পৌঁছয় না শুধু বিকিরণ হারানো তারকা
কালো গহ্বরের মতো জেগে আছে, তিনি তাঁর ভূমিতে পা রেখে
মুহূর্তে জাগান ধ্বনি মুহূর্তে জাগান আলো মুহূর্তে জাগিয়ে দেন মেঘ ও বাতাস
তোমারও শরীর চেমনি ঋতবান করে তুলেছেন একদিন
তুমি কি কৃতজ্ঞ ? বলো হে পুরুষ বলো হে রমণী বলো হে পতঙ্গ
বলো কীট

তুমি কি সত্যিই চাও না হঠাৎ ঝলক এসে একবার দেখাক তোমার
জন্মের মুহূর্ত ক্ষিতি মৃত্যুর মুহূর্ত ব্যোম শৃঙ্গার মুহূর্ত অগ্নি, শিব !
পিঙ্গল জটার মধ্যে দুলছে অজস্র সাপ—পৃথিবীর সব পুরনারী
চলেছে মূর্ছার ঘোরে মূর্ছায় মিলিয়ে যাচ্ছে জটার ভেতরে গঙ্গাধারা ...
তারাই গোপিনী দল, তারা মেঘ, আর সেই মেঘ ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আজ রাত্রে বৃষ্টি এল, ঢেকে গেল দূরের জঙ্গল
আর এই বৃষ্টির রাত্রে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমি একা আমার মৃত্যুর
স্নিগ্ধ মুখ তুলে ধরি গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে তোমার ...

অপচয়

তাকে আমি অপচয় করলাম এভাবে :
প্রথম, বিষাদ সিন্ধু, আগে বইটা পড়াই ছিল না
পড়লাম, সেই সঙ্গে দ্বিতীয়টি, শ্রীমদ্‌ভাগবত
তৃতীয় যা রাজহংস, কয়েকটিকে ছাড়লাম পুকুরে, তাকে আমি
মুগ্ধ করে ফেললাম যে-কটি উপায়ে তার চতুর্থটি নেই
পঞ্চমটি হল গিয়ে ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪
ষষ্ঠ প্রফেসর শঙ্কু, সপ্তম কারণ এই শ্রীমান
মানে আমি নিজে, ফলে সোনার তরীর সব ধান
কিছু খেল ঘুঘুপাক্ষী, লোকে কিছু নিয়ে গেল কিনে
শ্রীমতী স্বপ্নের কথা কী বলবো বলুন, এই আপনাদের নিয়ে
আর পারা যায় না দিদি, বলুন একী অপচয়
একী অপচয় এলে আজকের দিনে !

স্বৈরিণী

মৈনাক যখন তোমার চুল নিয়ে খেলছিল আমি ঠাকুরকে ডাকছিলাম।
সে যদি সত্যি কোথাও থাকেই তবে সামনে এসে দাঁড়াক, তার পিঠ চাপড়ে
বলবো : 'ও ভাই কৃষ্ণকানহাইয়া –বাঁশি আমার তৈরি করাই আছে !'
যখন ওর কোলের ওপর নিজেই তুমি লুটিয়ে পড়ছিলে, আমি
উল্টোপাল্টা লোক, আমি সামান্য দর্শক, কী কষ্টে যে না চেঁচিয়ে
চুপ করে থাকছিলাম আমি বর্ষাকে ডাকছিলাম –যদি সত্যি
কোথাও থাকে তবে এক্ষুনি সে আসুক, তার বজ্র আর বৃষ্টি দিয়ে
ঘিরুক তোমাদের বাচ্চা যেমন পেটের মধ্যে নিজেই নিজের
জায়গা করে নেয় তেমনি করে আছি আমি ওদের সঙ্গে
আছি আমি তেমনি করে মিশিয়ে দিচ্ছি ওদের সঙ্গে আমারও নিঃশ্বাস
কিন্তু হতচ্ছাড়ি, তোর ঠ্যাং ভাঙব আমি ফের যদি তুই অন্য কোথাও যাস্ !

সূর্য ও বাতাস

সূর্য, বাতাসের কথা ভাবো একবার। সে ছিল তোমার প্রতি ধাবমান
যুগ যুগ ধরে। তবু পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাতে পারেনি। আজ
স্নানার্থে এনেছো তাকে জলধিপ্রভার সামনে, তার রুগ্ন চীরবাস খুলে
দিয়েছো মরণধৌত ঢেউ, বেগবান। সূর্য, তুমি এতদূর পারো ?
সে ছিল কেমন যেন ! যাকে ভালোবাসত তার নামও জানত না। সে
ছিল আকাশযাত্রী। কত
পেখম মেঘের দেশে ভেসে গেছে অযাচিত
কত ছাদ থেকে ছাদ শূন্যে উড়ে গেছে রাঙা পরিধান –
খেয়াল করেনি কিছু। বর্ষাদের
হৃদয় তা জানে।...আজ
এনেছো মরণধৌত ঢেউ তুঙ্গ ঢেউ আর স্নানপূজা সমাপন করে
মেলেছ কী শিখিপাখা ! তাই বুঝি মায়া সে কাটাল বুঝি তাই
তার কুশপুত্তলিকা পড়ে রইল ইহকালান্তক নদীতীরে। ওগো তীর,
তীক্ষ্ণধার,
সে সহ্য করেছে কত ! কত সে তোমার প্রতি উড়েছে জীবনভোর
অন্য কারোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখেনি। আজ তাকে
অন্তিমে এনেও আরো দগ্ধ করা প্রয়োজন কিনা
তা তোমার মন জানে।
সে কেবল সমুদ্র পৃষ্ঠায়
লিখেছে নিজের কথা। যাকে স্বপ্ন দেখেছিল, কোনোদিন নাম না জানুক –
আকাশগ্রন্থের সামনে সে কেবল বলে দিয়ে গ্যাছে, তাকে
ভালোবাসব মৃত্যুর পরেও...

রাখী

হাতে বেঁধেছো রাখী, এবার
তোমরা ভাইবোন
মুহূর্তের দুর্বলতা
মনে রেখো না মন

তুমি এবার ভগ্নী হলে
আমি তোমার ভাই
আদিম ভাইবোনের কথা
আমরা ভুলে যাই

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
গাছে ডাকছে পাখি
ভুলের কথা ভুলে হঠাৎ
আগুনে হাত রাখি

অসামান্য আগুন, সেই
আগুন অসাধারণ
একটি বার রেখেছ হাত
দুবার রাখা বারণ !

একটি বৃষ্টির সন্ধ্যা

চোখ, চলে গিয়েছিল, অন্যের প্রেমিকা, তার পায়ে।
যখন, অসাবধানে, সামান্যই উঠে গেছে শাড়ি –
বাইরে নেমেছে বৃষ্টি। লণ্ঠন নামানো আছে টেবিলের নীচে, অন্ধকারে
মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে লুকোনো পায়ের ফর্সা আভা ...

অন্যায় চোখের নয়। না তাকিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না।
সত্যিই ছিল না ? কেন ?–হুহু করে বৃষ্টিছাট ঢুকে আসে ঘরে
সত্যিই ছিল না ? কেন ?–কাঁটাতারে ঝাঁপায় ফুলগাছ
সত্যিই ছিল না ? কেন ?–অনধিকারীর সামনে থেকে
সমস্ত লুকিয়ে নেয় নকশা-কাটা লেসের ঝালর...

এখন থেমেছে বৃষ্টি। এখন এ-ঘর থেকে উঠে গেছে সেও
শুধু, ফিরে আসছে হাওয়া। শুধু, এক অক্ষমের চোখের মতন
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে টেবিলের তলার লণ্ঠন।

বিধি

কী উপদেশ দাও হে বিধি, নিজে বা তুমি কী নির্দেশে চলো হে ?
এ-মন মধুপ্রার্থী আজো, কত বংশ ধরে সে করে গান
সে-গানে মন দেয় না শ্রোতা, যে যার মতো লিপ্ত থাকে কলহে
দিন কাটালে ভিক্ষা করে, রাত্রে হও সমুদ্রে শয়ান

এ-সমুদ্র দিনের বেলা কালো সোনার বটে
অবরুদ্ধ করেছ, আমি চিরশূদ্র লোক
মৃত্যুকালে দেখি সকল গাছের পারে আলো
চোখের পারে একটি দুটি তারার খোলা চোখ

জীবনে মধু বারণ, তবু মুগ্ধ হওয়া কাজ
সে-কাজ আমি করেছি, গান বেঁধেছি মধুশাখা
মূর্খ সেই কাব্য ছিঁড়ে গ্রন্থহারা প্রমাণ করে আজ
গগন পথে উড়েছে তার পরমহংস পাখা !

ছাত্র

হাত ধরে ধরে নিয়ে গেলে অন্ধকে
তোমার বাবার ছাত্র ছিল সে, এখন সে কার পড়ুয়া ?
যদি সে তাকাতে পারত তাহলে তোমাকে দেখত যে-চোখে
আমি ওর হয়ে প্রায় সেই চোখে তাকিয়েই চোখ নামালাম
তুমি হাত ধরে, তুমি হাত ধরে ধরে
অন্ধকে নিলে বারান্দা পার করে।

বারান্দা ? না কি বসবার ঘর ? বেতের চেয়ার চারটে
ছোট্ট টেবিল ঘিরেছে–আমরা বসে আছি তিনজন
তুমি কার মেয়ে, তখনো জানি না, আমি রাস্তার ছেলে
ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম –শোনো উদ্ধারকারিণী
আমিও আসলে অন্ধ–কেবল
মুখেই বলতে পারিনি।

বলছি এখন। আমাকেও একজন
অন্ধ করেছে বন্ধু করবে বলে
চামচ ডুবিয়ে তুলে নিয়েছে সে দুইচোখ থেকে মণি
সেই থেকে চোখে রক্ত ফোঁপায়, রক্ত ফুঁপিয়ে পড়ে
রাস্তায় রাস্তায়
আমি রাস্তার ছেলে
দরজা খুলেই–আমাকে দেখতে পেলে
হাঁফাচ্ছি আমি, অতগুলো সিঁড়ি–অদ্ভুত সব লোক
তখনো জানি না, আজকেই পাব আজকেই ফিরে চোখ
তখনো জানি না, কত রূপ আছে, শত রূপ চোখ ভরে
দেখব আবার, আমিও দেখব, দেখলাম দিদিমণি
সব গোলমাল হয়ে গেল, আর একমুহূর্তে তুমি
কানা হাত, কানা খোঁড়া হাত, খোঁড়া কুষ্ঠের হাত ধরে
আমাকে নিয়েছ, আমাকেও নিলে, তোমার ছাত্র করে।

জানা অজানা

আমার দুর্গতি এই জানাঅজানার ঊষাকালে
একবার গেল, আর খুঁজে খুঁজে হলো হয়রান
বিরাম লভে না, প্রভু, বিরাম হবে না ? ধনপ্রাণ
মারা পড়ে যাবে ? সেকি ! দুর্গতি গভীর চিরকালে
কোন সাহসে চলে যাও পিছু না তাকিয়ে –দুই কূল
পিছা করে তোর...ওহে শ্যামসুন্দর, মনে মনে
কী মতলব করিয়াছ এবারকার পূর্ণিমাঝুলনে
কাহারো বাপের সাধ্য নাই, বুঝে ফ্যালে ! –বনে ফুল
জানাঅজানার। দেখে, খুশি আমি যারপরনাই !
আজো উত্তেজনা আছে, জ্যোতিষ্ক আমার উত্তেজনা
অনুভব করো, ধরো গলায় গলায়, বাবাসোনা
বন্ধু করে নাও –এই দুর্গতিরা হচ্ছে দুই ভাই
একটি ভাইয়ের জন্য তিনজন সখী ঊষাকালে
জল আনতে যমুনায় যায় আর গিয়ে কী ফ্যাসাদ !
বন থেকে বেরোন টিয়ে, চাঁদের কপালে তিনি চাঁদ
টি' দিয়ে মিলিয়ে যান –'এ' বেচারী একা একা গিয়ে
কদমতলায় কাঁদে আজ আমার আজ আমার বিয়ে –
হাতি নাচো, ঘোড়া নাচো, আছো যত দুঃখ আছো ভালে
নাচো নেচে নাও আজ তোদের একদিন কী আমার
একদিন, ঝেড়ে ফেলব, ঝেড়ে ফেলছি, দুর্গতিনাশন
আজ আমার হাত পাকড়ে ধরেছেন এ-যৌবনকালে
বোঝো এ-যৌবন কী জিনিষ ! সাংঘাতিক ! –হে পুরুষকার
তুমি আর কী সাংঘাতিক –আজ আমার শতঞ্জীব, চেয়ে দ্যাখো
আমার শতন
বেরিয়ে পড়ছেন, সঙ্গে আমি, সঙ্গী আমি, সামনে
জানাঅজানার ফুলবন...

বর্ষা

বৃষ্টির সমস্যা এই যে, বৃষ্টিদিন বলে : 'দিদি নাও
আমার জলের তোড়।' দিদি যদি নেয়, অত রূপ
এক মুখে বলা যায় না—আমি ব্যাটা কবি কোন্ ছার !
গাওয়া যায় না, গীতিরূপ, চাকরবাকর হয়ে গেলে।
আমি হয়ে গেছিলাম, আবার সম্মান নিয়ে এলে
নতুন বৃষ্টির দিন, নতুন বর্ষার দিদি এল
এসে পড়ল বলে আর পাগল হব না কোনোকালে
পাগ্‌লা-করা লোক হব, আমি, দিদি, তোমার কপালে !

পলাশ ও পলাশ

কোথা সূর্য, প্রিয়ংবদ ? কোথা হে সলিলভরা কূপ ?
পাগলের সঙ্গে দুটো কথা বলো। সে তাকিয়ে আছে অস্তাচলে
যে-মেঘ চলেছো দূরে, চলেছ যে-পাখি, তার ডানার বাতাস
কথা বলো, দুটো কথা, কী কোন্ বিষয় নিয়ে, থাক্ ওসব, বলো
জলহাওয়া।

সূর্য কার ? সূর্য কার ? পলাশ ও পলাশ, ভুলে গেছি।
জল বলে, 'আমার' ; গাছ বলে, 'দেব, আমার না হলে
কারো নও তুমি !' তবে আগুন কোথায় থামল ? জ্বলবার আগে সে
কোথায়
ছিল ঘুমে ?—মনে পড়ছে না কিছু, পলাশ ও পলাশ, পড়ো মনে।
পড়ো হে কিরণ পড়ো ছন্দ করে ঘরের চুলার পাঠকাঠি
প্রভাতে জঠরচিন্তা করে দুই সহোদরজন
উনুনের ধারে বসে। তথা সূর্য, জীবন্মৃত, তথা হে সলিলহারা কূপ
জলে ভরে এসো, আলো ভরে এসো, অন্নসাধনার আয়োজন
যে করে অনেক কষ্টে, অস্তে যে তাকিয়ে থাকে, পলাশ ও পলাশ, খুশি হয়ে
বলো সে-পাগলকে বলো দুটো কথা, সম্মান যাবে না, বলো যথা
অগ্নি বলে প্রয়াতের মুখে, বলে মূর্খ কবি তার
অগোচর পাঠকের প্রাণে :
'সত্যি যদি পরলোক বলে কিছু থাকে, তবে
একদিন সন্ধেবেলা, পায়ে হেঁটে
পৌঁছব সেখানে !'

বসন্তসেনানী

চলো অন্তরালে, এই মালা তার পথিকে শেখাবে
ঢেউ,
চলো ঢেউয়ে চলো, ঢেউ তার তরীরে শেখাবে
দেয়া,
শোনা দেয়া ডাকে নাম ধরে সবারে, এবার
পাখি নৌকো ছেড়ে দিই বাতাসে, সমুদ্রদেব দূরে
এপাশ ফেরেন, বটে, ওপাশ ফেরেন, তাঁর বালুকাবেলায়
কড়াই ঝিনুক আর হাতে ধরি ধরি দাঁড়াই তো সবাই
নাচি গাই ঘিরি ঘিরি, সবাই তো ঝাউশাখা, ঝাউসহচরী ...যাও, ওর
অন্তরালে, কথা আছে...
কথক, অবাক মানে লোক !
এত সব রঙ্গ ছিল, আউল বাউল ছিল তোমার নাট্যমে
অতীতে বুঝিনি নটো, এই তো এক্ষুনি মোক্ষম
বুঝলাম, পৃথিবীতে এমনধারা লতাগাছও আছে ?
জুড়াল এমন করে, লতা এল হাতপাখা হাতে
হাওয়া দিল যত্ন করে, পাতিল আসন, থালা ঘিরে
সাজাল ব্যঞ্জনবাটি, বলিহারী, কী সোয়াদ তার !
তারপর কত কী হল –গালগপ্পো নাগাল না পায়
দুপুরে এক ঘুম দিই, উঠে দেখি সে ঘুমিয়ে আছে
মোর পার্শ্বে গুটিশুটি, হেঁকে বলি : 'কে আছিস, কে খেলিবি আয়
আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় আমি একশোবার ফিরাইব তায় –'
বলেই ছুটলাম, রাত্রি আমার সহিত ফিরল, ছুটে এল যত অলিকুল
দলবেঁধে নয় জেনো, পৃথক পৃথক এল পৃথা সব শরতে হেমন্তে গ্রীষ্মে
শীতে
দেখিওনি, চিনতামও না–বসন্তসেনানী তারা, বরষাতেও এসে যথাকালে
ঘাট থেকে ছেড়ে দিল তরী, মানে খেয়া, মানে নৌকা আজ
কপাল ফিরিয়ে দিল পথিকের হাতে

তুলে দিয়ে ঢেউ,
আর ঢেউ তার পাখিকে উজাড়
করে দিল স্রোত,
আজ স্রোত বলে : ‘চলো, অন্তরালে চলো, পরী
দেয়া ডাকছে আমাদের নাম ধরে, শুনতে পাচ্ছ না ?
কী হবে অতীত নিয়ে –
চলো, পুনর্বার প্রেমে পড়ি।’

মালিকা

শুনেছি মালিকাফুল গাছে
আছে, যুবরাজ-বাঁশি আছে

দেখেছি মালিকাময়ী গ্রাম
তীর-চিহ্ন যুবরাজ নাম

সেখানে প্রত্যেক মধুমাসে
কতই বিদেশী পাখি আসে

ভুলে যায় কার কী পালক
যুবরাজ বেখেয়ালী লোক

পালকেরা বলে কানে কানে
মালা গেছে মুরলী সন্ধানে

এ-সময়ে কথা বলতে আছে ?
গাছে গাছে বৃষ্টি নেমে আসে

এ-বৃষ্টিতে বাইরে আছে কারা
যারা ঘর বেঁধে নেবে, তারা

আমরাও বাঁশি ভালোবাসি
যা দেখার তাই দেখে আসি

কী দেখেছ ? কী দেখেছ ? বলো !
চুপ, চুপ—দু-চোখ জুড়ালো :

আয় ঘুম, আয় বৃষ্টি, আয়
মুরলী মিশেছে মালিকায়...

লীলাচ্ছল

যে আজো অঝোরে বলে ‘ভালোবাসো’ –এত অসহায় !
দিনান্তে তোমার জল ছোঁয় মণিমাণিক্য হারায়
পথে যে-চিরনবীন ডিঙ্গা ভাসে দিবাবিভারবী
জলে যে-পথিক হাঁটে, বলে : দাও, খুলে দাও তরী
সবই কি উপেক্ষাযোগ্য হতে পারে ? দিন অন্তে জল
ছুঁয়ে যে-জীবন পায়, মাণিক্য হারায় পুষ্পদল
ওড়ে সে-বৈরাগ্য শূন্যে, ফ্যালে পুষ্প পাড়ায় পাড়ায় –
তাও কি খেলার দ্রব্য মনে করো, বলো লীলাচ্ছল !

ডানা

তীর্থ, এই বৃষ্টিশেষ ডানায় কার
ঘুমের গান ঘুমোলো ?
তীর্থ, এই গোধূলিকাল পুনর্বার
মুকুলগুলি ফেরাবে

তীর্থ, আমি প্রথমদিন বলেছিলাম :
‘উচিত নয় এগানো’
তীর্থ, আমি বারণ করে দিয়েছি : ‘নাম
উচ্চারণ কোরো না’

তীর্থ, তবু বৃষ্টিছুট ডানার ধার
ঘর কি পর মানেনি
তীর্থ, সেই গোধূলিকাল পুনর্বার
তুষে আগুন ধরাল

তীর্থ, জেনো এই সময় পুষ্পচোর
প্রাণেরও ভয় করে না
তীর্থ, এল চৈত্রমাস, হাওয়ায় তোর
ধুলার চুল ছড়ানো

ধুলায় নাচে তা থৈ কোন্ মহেশ্বর
তীর্থ, আমি জানিনা
অকালে এই বৃষ্টি কেন ভাসায় ঘর
তীর্থ, কাকে বোঝাব

বরং ওই মৃত্যুময় ডানায় তার
মুখ রেখেছি আমিও
তীর্থ, আমি আকাশ থেকে আকাশপার
বৃষ্টি উড়ে চলেছি

আলো

তুমি, তুমি, তুমি ঘুমিয়েছ ? আলো ? আমি উঠে গিয়ে
মেঘ সরিয়ে দিই
আমার আনন্দ রক্ত ফিনকি দিয়ে মেঘে মেঘে লাল
কাল বৃষ্টি পড়ছিল, সারাদিন ধরে বৃষ্টি, ধোঁয়া বৃষ্টিজাল
আমি সারারাত্রি জেগে পরিষ্কার করেছি আকাশ
তুমি, তুমি, তুমি ঘুমিয়েছ ? আলো ?
আজ আর তোমার কাছে কিচ্ছু লুকাবো না
তোমাকে গোপনে বলছি—এই আমি জল মাত্র, বায়ু মাত্র,
তোমাকে গোপনে বলছি—এই আমি জল মাত্র, বায়ু মাত্র,
বুঝতে পারছ, মাত্র প্রাণ—আর প্রাণ পতঙ্গের চেয়ে
বেশি শক্তিশালী নয়। মরবে ফাল্গুন মাসে, এই গর্বে ভোরে উঠে
সে মেঘ সরায়
এই গর্বে, সূর্যমণ্ডলের শেষ গুরুগৃহ থেকে
একজন ছাত্র এসে পৌঁছলো এখানে, তুমি ঘুমিও না আলো—
সে মরবে দোলের দিন—দোল, দোল,—এই গর্বে আনন্দের পথে
উঠে গেছে মেঘ, রক্ত মিশে গেছে মেঘে আর
গর্বে রক্তে বসন কি রাঙা না তোমার ?
ওঠো, এই, আলো, উঠে পড়ো :
সে এসেছে। হ্যাঁ, তোমাকে পাঠ করবে সে।

ঝাউপাতাকে রুগ্‌ণ কবির চিঠি

ঝাউগাছের পাতা, তোমার মৃত্যুনাম সকালবেলার পাখি
ঝাউগাছের পাতা, তোমার দিবসদীপ সোনারঙের বালু
ঝাউগাছের পাতা, আমায় ডাকলে কেন সন্ধেবেলা ঢেউ
ঝাউগাছের পাতা, তোমার ঘুম পাঠানো মৌমাছিরা ভালো
ঝাউগাছের পাতা, আমার নাম মনে নেই ? ঝর্নাপারে থাকি –
ঝাউগাছের পাতা, আমায় স্বপ্ন দিতে আপত্তি কিসের

ঝাউগাছের পাতা, তোমার ভোরের নাম একটি ঘুমপাখি
ঝাউগাছের পাতা, তোমার জন্ম হল সাগরতীরে আলো
ঝাউগাছের পাতা, এবার ঝর্নাজলে শরীরখানি পাতো
ঝাউগাছের পাতা, দিলাম সকল মুকুল বসন্তকে ঢেউ
ঝাউগাছের পাতা, ছিলাম নৌকাটিরও পথ দেখানো তারা
ঝাউগাছের পাতা, যখন নিশীথময়ী বসনভূষণ হারা
ঝাউগাছের পাতা, তখন ছন্দে তোমায় গান শিখিয়েছিলাম
ঝাউগাছের পাতা, আমি তোমার কাছে চুম্বন চাইব না

ঝাউগাছের পাতা, তোমার জন্মনাম ভোরবেলা কী ভালো
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় গান শোনাল দূরদেশী পথিক
ঝাউগাছের পাতা, তোমার বৃষ্টি এলে চুল ভেজানো চাই
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় তরুণরা সব নতুন লেখা দিক
ঝাউগাছের পাতা, এবার চা খাবে না ? বই নিয়ে বসবে না ?
ঝাউগাছের পাতা, তোমার মিত্রাদিদি ভালো তো শিলচরে ?
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় সাগর দিলেন তলহারানো চোখ
ঝাউগাছের পাতা, তোমার নতুন নতুন পুরুষবন্ধু হোক
ঝাউগাছের পাতা, আমি আসতে যেতে কুশল নিয়ে যাই
ঝাউগাছের পাতা, আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো ?

বরষাবন্দনা

এসো বর্ষা শ্যামা পাখিটির
ডানা ধরে এসো, আবরণ
ফেলো মুখ থেকে। ক্রুবাদুর
স্তোত্র শুনি, দু-নয়ন ভরে
স্তোত্র শুনি, সারা মনেপ্রাণে
স্তোত্র ঢালি, দুই কান ধরে
ওঠবোস করি, –গানে গানে
মাত হয়ে রই মহীয়সী
এসো বর্ষা, কী চাহো তা বলো –
আছে প্রাণ, অসমসাহসী !
এসো বর্ষা শ্যামা পাখিটির
ডানা ধরে এসো, চন্দ্রচূড়
হতবাক হল, কালো কেশে
কত তারা মুরছি পড়িছে
সে-খেয়াল নাই পথভোলা
সেতু ’পরে না ঝুঁকো না অত
মাথা ঘুরে পড়ে গেলে নীচে
কী হবে ? (কে ভাবে অতশত !)
দেখিলে না দ্বার আধো খোলা
দ্বারে ছিল নয়ন চঞ্চল
ন্যালাখ্যাপা বাবু পরিমল
ফেলে কড়ি মাখিলে না তেল
সরল বিশ্বাসে বেচে দিলে
দু-টাকায়, তিনটি আপেল

ইতিমধ্যে শ্যামা পাখিটির
পিছু নিল আষাঢ় যুবক
কত কী সম্ভব এ জীবনে

জানিলে না ওগো আহাম্মক
দ্যাখো দিকি এই ত্রিভুবনে
ঘোরে কত প্রাণের ইয়ার
এ-জগতে উপযুক্ত মাল
কোথা পাব গেলে ইহকাল
খুঁজে খুঁজে হই দিশাহারা
হেথা হোথা খসে পড়ে তারা
ঠারে ঠোরে ডাকে বারংবার
শুনি না মনের ভুলে, আর
সেই ফাঁকে আমার শ্রবণে
পশেছো হে পাজী কোথাকার !

আজ দ্যাখো নীল নবঘনে
আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই
শুধু তোর জন্যে আছে রাখা
দুটো সিট, বাঁদিকটা খালি
চোখে দাও ধুলো, গুড়ে বালি
তোর প্রিয়া বসিবে ওখানে
সহি তরিকাসে, ও দিওয়ানে
রূপ তো বাতাও। কানে কানে
রূপ পড়ো রূপ বলো রূপ-
নারানের কূলে উঠিলাম
বলো এ জগৎ স্বপ্ন নয়
নিউ ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়
স্টেট ব্যাংক (রানাঘাট শাখা)
ওয়াচ কোং, নতুন বাজার,
বাণী স্টোর্স, তারক ফার্মেসী
স্কুল কলেজগামী ছেলেমেয়ে
ছুটন্ত অফিসযাত্রী দল
ছবিঘর, মলিনা টকীজ

শেষদিন একান্ত আপন
চলিতেছে অনুরাগের ছোঁয়া
আগামী শুক্রবার থেকে
মিঠুন শ্রীদেবী অভিনীত
ঝিংচাক, ঢিসুম ঢিসুম
ভালোমন্দ ভালো কম বেশী
বনবালা গার্লস হাই স্কুল
বিশুদার কোচিং সেন্টার
প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা
শিবহরি উচ্চ বিদ্যালয়
এখানে টাইপ করা হয়

আপনার ভাগ্য আপনারই
এখানে দুপুরবেলা খুন
এখানে ২৪ ঘণ্টা বন্ধ
আজ গেছে ফুটো, কাল বাপী
দু-বাঁও তিন বাঁও জল মাপি
আজ একরকম ছন্দ, কাল
আরেকরকম ছন্দতাল
স্তবকে স্তবকে ছন্দ চুর
‘কোনো এক গাঁয়ের বধূর
কাহিনী শোনাই শোনো’ গান
মোড়ে মোড়ে ক্যাসেট দোকান
আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো
মন, দ্বারে দ্বারে থানা পাতো
এখানে মানুষ মারা হয়
এখানে সন্ধের পরে ভয়
এখানে তোমার বন্ধু ভয়
এখানে তোমার বন্ধু জয়
নয়, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়

এ জগৎ...

আমাদের কোথা নিধুবন ?
আমাদের নিধুবন কোথা ?
আমাদের প্রণয়ক্ষমতা
এখানে চুরমার জেগে ওঠে
সেই, চোখে চোখ পড়ে যাওয়া
সেই যে দক্ষিণ থেকে হাওয়া
পড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে জোটে
ফাঁকিবাজ ছেলে, জুটে যায়
বিড়ি বাঁধা রতনের পাশে
ও বাড়ির ঠিকে ঝি কদম
এলো বর্ষা, খুনী মফস্বলে
আলবেলি কিনারে ঝমাঝম !

বাত, অর্শ, ফোড়া, ভগন্দর
কফ, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ,
অম্ল ও অজীর্ণ, স্তনপাকা,
একশিরা, একজিমা, কার্বাঙ্কল,
হাঁপানী, সন্তানহীনা, টাক
পাগল, গ্যাস্ট্রিক আলসার
সবকিছুর অব্যর্থ ওষুধ
অমুকের স্বপ্নাদ্য মাদুলি
ঋতুবন্ধে জন্মনিয়ন্ত্রণে
অভিজ্ঞ ডাক্তার, পাকা হাত
সে হাতের সর্বভূতে গতি
ট্রেনে, পথে, বাসে, ইউরিনালে
সে দেবে জোঁকের মুখে নুন
সে-ঔষধ, সে-মহাঔষধ
হাঁটাপথে মাত্র সাত মিনিট
(প্রয়োজনে ডাকযোগে লিখুন)।

আমাদের শতোত্তর নাম
আমাদের কোনো নাম নেই
মার খাব, ভেঙে পড়ব কেন ?
প্রেম করব যমের সামনেই
এই আমাদের কুঞ্জগীতি
এই আমাদের নিধুবন
এই আমাদের কবিকৃতি
এই আমার পড়োশি জীবন
কই কবি ? কবি সে কোথায় ?
যে ধরে সহস্রধারা মন ?
যে ধরে সমস্ত ছন্দ ? ধরে
কনিষ্ঠায় গিরিগোবর্ধন ?

সে-কবিকে খুঁজে পাব বলে
এ-বর্ষায়, এই ঝড়জলে
আজকে আমি এসেছি রাস্তায়
একা মানুষ, কত ঘোরা যায় !
বরং তুমিই যাও নিজে
সে-কবির প্রেম প্রয়োজন
তোমারো সমস্ত চুল ভিজে–
জীবনে তো কত কিছু হয়
বলো ওরে চলো নীপবনে
না, কভু আমার জন্য নয়
আমি তো সে নই, আমি জানি
তুমি সে-কবির জন্য আজ
মুখ ঢাকা পানপাতাখানি
বারেক সরাও, গন্ধরাজ !

এই মালঞ্চে

এই মালঞ্চে মৃত্যু লেখা
ঘুরছে পায়ের তলার মাটি
সবাই ঢলে পড়ল সুরায় –
জাগে কেবল
ঝাউপাতাটি

এই মালঞ্চ নিয়তিময়
ফুল ধরেছে মৃত্যুগাছে
বাইরে যাবার রাস্তা কোথায় ? –
শুধোও না ঝাউপাতার কাছে !

মালঞ্চে এই মৃত্যু লেখা
মৃত্যু সোনার পাথর বাটি
যখন খুশি পথ হারাব
সঙ্গে থাকুক
ঝাউপাতাটি !

গান

পবিত্র দুধ, তুমি
কুমারীর বুকে এসে
কী কাণ্ড বাধিয়েছ !

দুই বুক থেকে গান
যে শুষে নিচ্ছে, সে
প্রেমিক না সন্তান ?

এতদিন ধরে তাকে
ছুটিয়ে মেরেছে পথ
পুড়িয়ে মেরেছে বালি

আজ সে পালিয়ে এসে
বুকে মুখ লুকিয়েছে
চুল ভরা ধুলোবালি

বুকে ওর মুখ মাথা
কেশভরা নাও ঢেকে
সবার সামনে থেকে–

আজ আর কিছু নেই
কিছু নেই আর–খালি
কুমারীর দুই বুকে
ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী !

বসন্ত উৎসব

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
স্মরণ-অতীত সাঁঝবেলারা সব
এগিয়ে দিতে এল নদীর ধারে –
নদীর ধারে বসন্ত উৎসব

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
পথ চললাম দুর্বাদলের পথে
আমার হাতে চিরঅতীত কাল
রৌদ্র পড়ে সুদূর ভবিষ্যতে

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
সঙ্গে এল বাংলাদেশের নদী
বলল : 'তুমি কোন সময়ে থাক ?
গিয়ে তোমায় ঘরে না পাই যদি ?'

ঘরের পাশে আকাশ –ধনুক-বাঁকা
আগুন রঙের সাঁকো !
স্মরণ-অতীত সময় এপার ওপার –
কবি, কখন কোন সময়ে থাক ?

অন্ধ, আমি বৃষ্টি এলাম আলোয়
পথ হারালাম দূর্বাদলের পথে
পেরিয়ে এলাম স্মরণ-অতীত সেতু

আমি এখন রৌদ্র-ভবিষ্যতে

জন্মদিনের কবিতা

অসাধ্য নয়, কিছুই এখন
অসাধ্য নয় তোমার পক্ষে
নদীর উপর নৌকো রাখো
পুরুষ রাখো নারীর বক্ষে

মাঠের শেষে গাছটি রাখো
গাছটিতে হও নিষিদ্ধ ফল
পথিকজনকে দেখাও পথে
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুণীদল

গ্রামের মধ্যে পথ পেতে দাও
পুষ্করিণী, পথের পাশে
নোটনরা সব নাইতে নামুক
কাপড় শুকোক দূর্বা ঘাসে

এসব যদি পারো ঠাকুর
এসো, আমার মাথায় চাপো
চূর্ণী নদী পার করে দিই –
সবার জন্য অন্ন মাপো !